ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1244-1255
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.344

একবিংশ শতকের বাংলা কবিতার স্বরূপ

কনক মণ্ডল, *গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The natural tendency of humans is to bring something novel to the center of discussion. Here, the word 'novel' is particularly significant. Bengali poetry, since its inception (Charyapada), has been constantly evolving. If its trajectory had remained the same, the word 'novel' would have been redundant. However, the diverse treasure trove of Bengali poetry has not disappointed us; it has taken turns like the flow of a river, and repeatedly so. This turning point is what Rabindranath Tagore referred to as 'modern'. In the post-2001 contemporary Bengali poetry, it is not difficult to find originality. If we read the recent poems with a deeper understanding, we can see the novelty in many of them. Following the rule of change in Bengali poetry, there has been a clear transformation in the post-2001 contemporary Bengali poetry. And, it is undeniable that this change in the Bengali poetry scene is more vibrant and lively compared to previous times. In this article, we will attempt to understand how contemporary Bengali poetry is becoming 'new in form, new in spirit' with each passing moment. The new thoughts, distinct mentality, and above all, the all-encompassing experience of the 21st-century poets have gradually propelled them towards creating superior poetry. We will try to explore how the essence of 21st-century poetry is emerging through a few aspects.

Keywords: 21st century, poetry, modernity, imagery, globalization, reminiscence, daily life, mythological references, love, confession

কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনা শুধু আজকের নয়— সুদূর অতীত থেকেই এর ধারা বহমান। মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তও একটি সমালোচনাত্মক মন্তব্য করেছিলেন কবি কানাহরি দত্ত সম্পর্কে—

"কথার সঙ্গতি নাই নাহিক দুস্বর।
এক গাইতে এক গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥"

ভারতচন্দ্র পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'যে হৌক সে হৌক কাব্য ভাষা রস লয়ে'। যাই হোক, প্লেটো অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে একালের সাহিত্য-সমালোচকরা কবিতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আসছেন। বলাবাহুল্য, এই যে দেখার দৃষ্টিকোণ, বোধের উপলব্ধি— এটি সবার একরকম হবে এমন কোনও মানে নেই। কিন্তু প্রায় সকলেই নিজের নিজের পর্যালোচনায় সঠিক একথা মেনে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল অভিনব কোনও কিছুকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা। এখানে 'অভিনব' কথাটি সবিশেষ ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা কবিতা তার জন্মলগ্ন (চর্যাপদ) থেকেই নিরন্তর চলমান।

তার এই গতি যদি একইরকম থাকত, তাহলে 'অভিনব' শব্দটি হত পরিহার্য্য। কিন্তু বৈচিত্র্যময়ী বাংলা কবিতা-ভাণ্ডার আমাদের নিরাশ করেনি সে বাঁক নিয়েছে নদীর স্রোতের মতোই। এবং বারেবারে। এই বাঁক ফেরাটাকেই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আধুনিক'। আসলে বাংলা কবিতার দিক পরিবর্তন বোঝা যায় তো এই অভিনবত্বের গুণেই। ফলে অনেক কবিতা নতুন ধারার সৃষ্টি হিসাবে যথেষ্ট নাড়া দেয় পাঠকচিত্তকে। সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীকে। হয়তো সে কারণেই এখনও পর্যন্ত জীবনানন্দকে বলা হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। T.S. Eliot স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আধুনিক চেতনার কবি হিসাবে। কেননা, উল্লেখিত সবার মধ্যেই কাব্যচর্চার অভিনবত্বের সন্ধান মিলেছিল। কবির এই অভিনবত্বকে তাঁর অরিজিন্যালিটিও বললে অসংগত হবে না। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংগত একটি মন্তব্য করেছিলেন,

> "বড় সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তাঁর কাজ। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি।"[১]

২০০১ পরবর্তী সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মধ্যেও এই অরিজিন্যালিটি খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। একটু গভীর মননের সাথে যদি আমরা সাম্প্রতিক কবিতাগুলি পাঠ করি, তাহলে বহু সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে অভিনবত্ব আমরা দেখতে পাব। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাকে অবহেলায় আমরা দূরে সরিয়ে রেখে আমরাই মূল্যবান কোনও কিছু থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছি, এই বোধ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করানোর সময় এসে গেছে।

বাংলা কবিতার কালান্তরের নিয়ম মেনেই ২০০১ পরবর্তী সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মধ্যেও স্পষ্টভাবেই পরিবর্তন এসেছে। আর, বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা কাব্যজগতে এই পরিবর্তন অন্যান্যবারের তুলনায় যেন আরও সজীব— অধিক প্রাণবন্ত।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা প্রকৃতভাবেই যে 'নতুন রূপ, নতুন চেতনা'য় ক্ষণে ক্ষণে সাবলীল হচ্ছে, তা আমরা নীচে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করব। একবিংশ শতকের কবিদের নব চিন্তা, স্বতন্ত্র মানসিকতা, সর্বোপরী সর্বভুক অভিজ্ঞতা তাদের ধীরে ধীরে উচ্চতর কাব্য রচনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। কয়েকটি বিষয়কে আলোচনা করে আমরা দেখার চেষ্টা করব কীভাবে একবিংশ শতকের কবিতার স্বরূপটি আমাদের কাছেও উঠে আসছে।

এক

চিত্রকল্প

'Image' বা 'চিত্রকল্প' একবিংশ শতকের কবিতায় কীভাবে নির্মিত সেই আলোচনায় আসার আগে জ্যোতি ভট্টাচার্য চিত্রকল্পের সংজ্ঞায় কী বলেছেন জেনে নেওয়া যাক—

> "কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা যে কল্পনাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত হয়ে রূপবর্ণশব্দগন্ধস্পর্শ ও স্বাদ প্রভৃতি নানা সংবেদনের একটির বা একাধিকের স্মৃতি বহন করে এবং উদ্‌বোধ জাগায় সেই বস্তু চিত্রকল্প। চিত্রকল্পে চিত্রের আভাস থাকে। চিত্র সাধারণত দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু এই সংজ্ঞায় 'চিত্র' শব্দটির অর্থ ব্যাপক— চিত্রকল্প দৃষ্টিগ্রাহ্য তো হতেই পারে, তা ছাড়া শ্রবণগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য, ঘ্রাণগ্রাহ্য সবই হতে পারে, এবং যেসব সংবেদন আপন শরীরের অভ্যন্তরে প্রখর অস্মিতা বোধ জাগায়, সে রকম সংবেদনও চিত্রকল্পের বস্তু হতে পারে।"[২]

কাব্যের ভাষা অনিবার্য রকমে ব্যঞ্জনাধর্মী। সৎ কবির প্রয়োগে কথাগুলি তাদের ব্যবহারজীর্ণ আভিধানিক অর্থের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও গভীর দ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়, আর অর্থের সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেই

জানেন যে সার্থক কাব্যের ভাষার এই ব্যঞ্জনাশক্তি সচরাচর কোনও না কোনও ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। কবির আবেগ ও চিন্তা সমূর্ত হয় ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্যে আবেদনে, অর্থাৎ যে ধ্বনিরূপ, দৃশ্যরূপ, ঘ্রাণরূপ ও স্পর্শরূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে বাক্যের সমাবেশে তারই মধ্য দিয়ে কবির আবেগ ও চিন্তার সন্নিহিত হতে পারেন পাঠক। এই উপমা, রূপক প্রভৃতি পোয়েটিক ইমেজেই বাক্‌প্রতিমা।

একবিংশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ কবি **অর্ঘ্য মণ্ডলের** কবিতায় অস্থির যুগসংকটের সঙ্গে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার বহুরৈখিক চিত্রকল্প উঠে আসতে দেখছি। কিছু ব্যঙ্গ, কিছু অসহায়তা— সত্তার আকুতি নিয়ে ধরা দিচ্ছে তাঁর কবিতা। 'অগোছাল' (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের টানা গদ্যকবিতায় লিখছেন—

> "ওই তো সোমাঞ্জন কাকু ঘণ্টা নিয়ে বেরিয়ে আসছে... এই তো বইয়ের ব্যাগে যা ছিল সকলই খোয়া গেছে, আর শ্রেণি-শিক্ষকের মতো নামডাকার খাতা বন্ধ করে মেয়েরা আমাকে আজ পড়া ধরছে, ওইসব লাল-লাল দিদিমণি ভালোবাসবার কথা গ্যাসবেলুনের গায়ে পেস্ট করে ছড়িয়েছে আকাশে-আকাশে। ওইসব লাল-লাল দিদিমণি যেভাবে ঠ্যাং-ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়... রাস্তা থতমত খেয়ে ডেকে আনছে জাতীয় সড়ক, সড়কেরা হেসে উঠছে এই ঘটনায়, ওই তো গাছের গায়ে হেলান দিয়েছে অন্য গাছ..."[৩]

কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যে কবি আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে ভালবাসা-বিশ্বাসের মিলনভূমিকে দেখাচ্ছেন। একবিংশ শতকের আরেক কবি **সব্যসাচী মজুমদার** 'মেঘ আর ভাতের কবিতা' (২০১২) কাব্যগ্রন্থে লিখছেন—

> "ততটা প্রাচীন তুমি অস্ত্র যত কাল...
> অসুখের চেয়ে ঘন এই ধানক্ষেতে
> ভিজেছ আদিম ভোর... ভিজেছ খবর...
> তবু কি বোঝোনি জিভ,
> জলের ছবিতে জল শুকিয়ে গেলেও আহা
> প্রেম থেকে যায়..."[৪]

'অসুখের চেয়ে ঘন এই ধানক্ষেতে'— কী অসম্ভব সাহসী চিত্রকল্প! ধানখেতের ঘনত্ব বোঝাতে কবি এখানে অসুখের প্রসঙ্গ এনেছেন। 'অসুখ'-এর বিস্তার আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণে— অদৃশ্যত। আর ধানখেত দৃশ্যত। চিত্রকল্পের সঙ্গে পাঠককে একটা কল্পনাও এ ক্ষেত্রে করতে হচ্ছে। এই কল্পনা ও চিত্রই পাঠককে কবিতা পাঠ করার ক্ষেত্রে আকর্ষিত করে তুলছে। বুঝতে চাইবেন কবিতা অন্তর্নিহিত অর্থকে। একবিংশ শতকের কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** তাঁর 'গোধূলি দহন' (২০২৩) কাব্যগ্রন্থে লিখছেন—

> "টর্চ হাতে পেলেই একটা মজার খেলা খেলতাম।
> ছোট ছিলাম তখন।
> টর্চের মুখ পাপড়ির মতো হাত দিয়ে চেপে ধরে
> আলোর সংজ্ঞা আটকাতে চাইতাম।
> কুসুম-লাল হয়ে উঠত হাত...
> এখন মুখের উপর হাসি টাঙিয়ে ব্যথা আটকাতে চাই
> অথচ প্রকৃত হাসি ফটাতে
> দাঁতের সঙ্গে ঠোঁটের সঠিক কৌণিক অবস্থান
> আনতে পারি না—ধরা পড়ে যাই!

তুমিও প্রেম আটকাতে চেয়ে উপেক্ষার দ্বারস্থ হও
কবিতাদেহে যেমন অপহ্নুতি অলঙ্কার...
এও এক আশ্চর্য খেলা!"[৫]

এই কবিতাটিতে ছেলেবেলার কথা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে টর্চের মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরার চিত্রকল্পের আশ্রয় নিচ্ছেন। এবং পরবর্তী জীবনে কবি যে ছেলেবেলার খেলাটির সঙ্গে হাসিটাও রেখে এসেছেন তা 'এখন মুখের উপর হাসি টাঙিয়ে ব্যথা আটকাতে চাই' পঙ্‌ক্তিতে স্পষ্ট। সমাজ ও সময় যে কবির মন থেকে আনন্দ ছিনিয়ে নিয়েছে তা পাঠক চিত্রকল্পটির কারণেই সহজে বুঝে উঠতে পারছে।

একবিংশ শতকের কবিতায় অসংখ্য কবিরা এমন চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যা পূর্ববর্তী শতকের কবিরা তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করেননি। আর এখানেই ধীরে ধীরে একবিংশ শতকের কবিতা স্বতন্ত্র হতে শুরু করেছে।

দুই
বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়নের প্রভাব সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বেশ গভীরভাবে পড়েছে। গ্লোবালাইজেশন-এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, বিশ্বকে একই প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করানো। ফলে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ইন্টারনেট, মোবাইল, গুগল, ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপ, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি মাধ্যমে মুহূর্তে পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। এইসব যোগাযোগ মাধ্যমগুলি বিশেষ করে একবিংশ শতকের কবিদের মনের মধ্যেই ফেলেছে প্রভাব। কবি **জয়দেব বাউরী**র একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ট্যাগ' (২০২৩)। 'ট্যাগ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির শিরোনাম যথাক্রমে এইরকম— 'অ্যাকাউন্ট', 'প্রাইভেসি', 'লগ ইন', 'লাইভে আসছি', 'টাইমলাইন', 'প্রোফাইল', 'স্টোরি', 'কমেন্ট', 'সেলফি', 'লাইক' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি বহুল প্রচলিত হতে দেখি একবিংশ শতক। বিশ্বায়নের যুগে আমরা যেমন বিশ্বকে হাতের মুঠিতে পেয়েছি, তেমনই নষ্ট হয়েছে আমাদের প্রাইভেসি। 'প্রাইভেসি' শিরোনামের কবিতার "আমার নিঝুমে আর কান পাতা আছে!"[৬] পঙ্‌ক্তিতে কবি সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকলের গোপনীয়তা সংগ্রহ করছে কোনও বড় কম্পানি। কবির ভাষায় 'শ্যেনদৃষ্টি' পেতে বসে আছে সেইসব সংগ্রাহকরা। আমরা স্বাধীন অথচ স্বাধীন নই। শঙ্খ ঘোষ 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' কবিতায় লিখেছিলেন, 'পেটের আছে উঁচিয়ে আছো ছুরি/ কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি।' ভাবছি আমরা মুক্ত, কিন্তু পায়ে বাঁধা আছে অদৃশ্য শিকল।

কবি **বঙ্কিম লেটে**র কবিতাতেও বিশ্বায়নের ছাপ লক্ষ করা যায়। 'মমি' কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতাতে লিখছেন—

"আমি এই লাক্ষাগ্রহে তোমাকে হাতড়াই
হান্ড্রেড পারসেন্ট বার্ন নিয়ে রোজ নিদ্রা যাই"[৭]

'লাক্ষাগ্রহ' মহাভারত থেকে তুলে আনা শব্দ। দুর্যোধনের নির্দেশে পুরাচন তৈরি করেছিলেন লাক্ষাগ্রহ। যেখানে পাণ্ডবদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কবি ভস্মের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনকে। তাকে না পেয়ে হান্ড্রেড পারসেন্ট বার্ন নিয়ে অর্থাৎ পুড়ে যাওয়া ত্বক নিয়ে কবি নিদ্রা যায়। 'হান্ড্রেড পারসেন্ট বার্ন' কথা কবি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন বিশ্বায়নেরই ফলে। কবি জয়দেব বাউরী তাঁর সাম্প্রতিক একটি কবিতায় মানুষের জীবনকে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষা ট্যাগের সঙ্গে অপূর্ব বন্ধনে জড়িয়েছেন। এখানে কবির ভাবনার ব্যাপ্তি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্বায়নের একটি বড় মাধ্যম হল মিডিয়া। ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপের যুগে দেশের অতি গোপনীয় কথাও এখন আর সংগোপনে থাকতে পারে না। কাউকে আবার জনপ্রিয়তার

শিখরে পৌঁছে দিতে যেমন পারে, তেমন আবার মাটিতে ফেলতেও পারে এই মিডিয়া। বিশ্বায়নের ফলে একবিংশ শতকের কবিতার স্বরূপকে পালটে দিচ্ছে সন্তর্পণে।

তিন

স্মৃতিচারণা

একবিংশ শতকের কবিতায় স্মৃতিচারণার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক কবিই স্মৃতিমন্থনে বিভোর। মানুষ আনন্দ পেলে পূর্বস্মৃতি অনেক সময় মনে করে সেই আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে মানুষ যখন দুঃখ পায় তখন বর্তমানের বিষাদকে সাময়িক লাঘব করার জন্য স্মৃতিমন্থনে চলে যায়। মনে করার চেষ্টা করে পূর্বের কোনও মনরাঙানো মুহূর্ত। এবং পূর্ব-সোনালি দিনগুলোকেই স্মৃতিতে আনার চেষ্টা করে।

অসমের কবি **সুতপা চক্রবর্তী**র 'ভ্রমরযান' (২০২৪) কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় উঠে আসছে স্মৃতিচারণা।

> "ঠাকুমারে লইয়া দুনিয়া ঘুরি। ব্যাটা-ঘোড়ার গাড়ি লই। কমটি বান্ধিয়া গুয়া লই। চাল মুড়ি চিঁড়া খই। উড়তে উড়তে দিঘিতে যাই। সারা বছরের জল খাই। সাজি মাটি ঘষিয়া দেই। মাথার চুলে মারে খেই। আরও উড়ি দুইজনে। বনেবাদাড়ে মনে-মনে। চলো, চলো তৈয়ার হও। শাড়ি পরো, সিন্দুর পরো। ব্যাটা-ঘোড়ার গাড়ি আইছে। তোমার দেশের লোক আইছে। দুগ্‌গা দুগ্‌গা হর হর। দুগ্‌গা দুগ্‌গা হর হর। আলতা পরো, সিন্দুর পরো। তোমার দেশের লোক আইছে। ব্যাটা-ঘোড়ার গাড়ি আইছে। তোমার দেশের লোক আইছে। ভ্রমর, ভ্রমর গো, ঠাকুমার দেশের ঘোড়া আইছে। ঠাকুমার দেশের লোক আইছে।"[৮]

ঠাকুমার ছেড়ে আসা দেশের স্মৃতিকথা কবির মনে ফিরে ফিরে আসছে কবিতাটিতে। ফেলে জন্মভূমির স্মৃতি ঠাকুমাকে কাতর করে তোলে। কবির ইচ্ছা ঠাকুমাকে ঘোড়ার গাড়ি করে সেই জন্মভূমিতে পাঠাবে। দেশের লোক অর্থাৎ যেখানে সেই ব্যক্তি বেড়ে উঠেছেন। যে দেশের লোকটি এসেছে তার সঙ্গে কবি ঠাকুমাকে পাঠিয়ে দিতে চান শাড়ি ও সিন্দুর পরিয়ে। ফিরে আসুক ঠাকুমার পুরোনো দিন।

কবি **অমিত সাহা** স্মৃতিচারণা করেই লিখছেন—

> "একটি সরলরেলা
> কতখানি কষ্টে বৃত্ত হয়,
> তুমি কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে
> সেকথা জানতে পারলে না!
> জানতে চাওনি
> ভাগ্যবলে হয়ে গেছ
> প্রেমিকার টিপ!
> যে কপালে আঁকা আছে
> ঘামেদের অনুবাদ,
> সে কপাল বুঝে গেছে
> প্রতিটি সকাল কেন পাগল-প্রধান!
> দুটি সরলরেখার কোল বেয়ে দুটি প্ল্যাটফর্ম,
> সবুজ বিষাদ আর
> পলাশ রঙের অভিমান..."[৯]

একটু কবিতাটির গভীরে গেলে বুঝতে পারব যে কবি তার প্রেমিকার স্মৃতিচারণা করছেন। প্রেমের পথ যদি সরলরেখা হয় তবে তার পরিণতি বাঁকা হতে হতে বৃত্ত হয়ে ওঠে। প্রেমিকার কপালের বৃত্তাকার টিপ মনে এলে কবির বোঝে এটাই তার পরিণতি। আর কবিহৃদয় পাগল হয়ে ওঠে প্রতিটি সকালে। 'পলাশ রঙের অভিমান' বলতে এখানে প্রেমিকার টিপের রঙকেই বুঝিয়েছে। একবিংশ শতকের কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** 'খেলা' কবিতায় লিখছেন ছোটবেলার স্মৃতির কথা। ছেলেবেলার স্মৃতিতে কবির মিশে আছে একটি খেলার ছবি। যা তাকে আনন্দ দিত। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময় ও সমাজের চাপে সেই আনন্দ কবির জীবন থেকে বিস্মিত হতে থাকে। আগেই বলেছিলাম যে স্মৃতি দুটি কারণে আসে এক. আনন্দ থেকে; দুই. দুঃখ থেকে। এখানে বেদনাই কবিকে ছেলেবেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। একবিংশ শতকের স্বরূপ এই স্মৃতিচারণা থেকেও পেয়ে থাকি।

চার

পুরাণ-প্রসঙ্গ

একবিংশ শতকের বাংলা কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ উঠে আসতে দেখা যায় বেশ কয়েকজন কবির লেখায়। এর আগের শতকের কবিরাও পুরাণ প্রসঙ্গ এনেছেন ঠিকই, কিন্তু একংবিশ শতকের লেখরা তাদেরকে স্মরণে রেখেই অন্যরকমভাবে উপস্থাপন করছেন।

সাম্প্রতিক কবি **রুমা তপাদার**-এর 'বালিকাপুরাণ' (২০২৩) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে প্রতিটি কবিতার বিষয় হিসেবে কবি পুরাণের নারীদেরকেই সামনে রেখেছেন। মিথ-পুরাণকে আত্মস্থ করে নিজের উপলব্ধির কথা তিনি লিখেছেন। কবিতা শিরোনামগুলিও রেখেছেন পুরাণের নারীদের নামকরণে। যেমন— 'দুর্গা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'শিখণ্ডী', 'মন্দোদরী', 'মেনকা', 'তুলসী', 'শূর্পনখা', 'দ্রৌপদী', 'বড়াই' প্রভৃতি। 'শকুন্তলা' নামক কবিতায় লিখছেন—

> "এসো মহারাজ, অপেক্ষা জন্মের
> যে যার পথের বাঁকে হারিয়ে যাবেই জেনো
> বাসর সংসার সব নতুন যা-কিছু আছে তারা
> ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে ঠিকঠাক সময়মতো
> এত দুঃখ এত কান্না এতটা যন্ত্রণা খেদ ক্লান্তি
> গলার সমস্ত শিরা টানটান দাঁড়িয়ে গেছে
> এখন কান্নায় শব্দ নেই জড়িয়ে পড়েছে ক্লান্ত স্বর
> বুকে কোনও নদী নেই হাড় মাংস নুনছাল সার
> আঙুলের দিকে নয় তাকাও চোখের দিকে
> এই অভিজ্ঞানে মনে কি পড়ে না বলো আমাকে তোমার?"[১০]

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের বেদনার কথা বাঙালি পাঠক সবাই জানেন। সেই চরিত্রের বেদনার কথা বর্ণনা করে কবি আসলে তার জীবনের না পাওয়া কোনও খেদের কথা কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, শকুন্তলার সারা জীবনের দুঃখের কথা অভিজ্ঞান হয়ে আছে আমার চোখে; যে চোখের দিকে তাকালে প্রিয় মানুষটির জন্য আলাদা করে কোনও অভিজ্ঞান বস্তু বহন করে আনতে হবে না। এইভাবেই প্রতিটি কবিতা কবি রুমা তপাদার তাঁর কবিতায় আধুনিক ভাষায় তুলে ধরেছেন।

কবি **ফাল্গুনী ভট্টাচার্য** ও কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলি নিয়ে যে কাজটি করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রথমে আসি ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের 'আ লো ডোম্বী' (২০২১) কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে। তিনি চার্যাভাষা আয়ত্ত করে পুরো কাব্যগ্রন্থটিই রচনা করেছেন চর্যাপদের ভাষায়। একটি উদাহরণ তুলে দেওয়া হল—

"শ্রীশ্রীবজ্রযোগিন্যৈ নমঃ
রাগ: ভৈরবী
(ফাল্গুনীসহজসিদ্ধাবিরচিতম্।)
বিষয় কামনা দূর গেলঅ।
বাঢ়ল মহাসুহ আশ॥১
উপবীঅ ছিণ্ডিআঁ লেলি।
চণ্ডালি সমএ সহবাস॥২
নাচন্তি চণ্ডালি বউকখে।
আশ্রু বহই চউকখে॥৩
ভণই ফাল্গুনী কান্দএ।
নিমজিঅ সহজানন্দে॥৪"[১১]

কবি চর্যার ভাষাটুকু শুধু নিচ্ছেন। এবার নিজের ভণিতা যুক্ত করে বৌদ্ধদর্শনের কথা বলেছেন। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে চর্যাভাষাতে লেখা কবিতাগুলির ভাবানুবাদও করে দিয়েছেন ছন্দে। যেভাবে 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' যুগে যুগে নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়, তেমনই কবি ফাল্গুনী ভট্টাচার্য চর্যাপদকে নতুনভাবে কাব্যের মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছেন।

কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** এই কাজটিই করেছেন, তবে বৈষ্ণব পদাবলিকে স্মরণে রেখে। তিনি মূলত বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষাকে আধার করেছেন কাব্য রচনার ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্যগ্রন্থটির নাম 'পদাবলীক্ষতপরিক্রমা' (২০২২)। 'পূর্বরাগ', 'রূপানুরাগ', 'অনুরাগ', 'মিলন', 'অভিসার', 'আক্ষেপানুরাগ', 'মাথুর', 'রাস', 'ভাবসম্মিলন', 'ভাবোল্লাস' পর্বগুলিকেই কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন ব্রজবুলি ভাষাতে। বিবেকানন্দ মণ্ডলও ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের মতো কবিতাগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন নিখুঁত ছন্দে।

"আজু হাম কৈছে রজনী গোঙায়ব
বঁধু হে, তুয়া দরশন বিসরিতে নারি।
তোঁহারি ভাবনারাশি, অযুত কুলিশ আসি
উজলিল সকল আন্ধিয়ারি।...
(পূর্বরাগ)
আজি কেমনে রজনী কাটাইব?
তব দরশন-সুখ কেমনে ভুলিব?
অযুত কুলিশ সম তোমারই ভাবনারাশি
রাতের আঁধার মোর উজলিল আসি। ...
(অনুবাদ)"[১২]

একবিংশ শতকে এসে রাধার পূর্বরাগের চঞ্চলতাকে তুলে ধরতে কবি পদাবলিই ভাষাকে ব্যবহার করছেন। পুরাণপ্রসঙ্গ এভাবেই একবিংশ শতকের কবিতার স্বরূপকে আমাদের সামনে লিপিবন্ধ করছে।

পাঁচ

প্রেম প্রসঙ্গ

পৃথিবীর এক অবিনশ্বর অনুভূতির নাম প্রেম; এক স্বর্গীয় চেতনার উপলব্ধি প্রেম। আর প্রেমী? তিনি কে? তিনি, নারী বা পুরুষের অবয়বে— প্রেমের আধার। প্রেম অবিনশ্বর। প্রেমী অবিনাশ। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রেমের

কবিতা বলা যায় তার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে। কাব্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলা কাব্যে প্রেমের স্বরূপ তার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই বদলেছে প্রতিটি দশকে। বদল ঘটেছে একবিংশ শতকেও।

কবি **সুকৃতি সিকদার** তাঁর 'ভবঘুরে এক তৃণভোজী' (১৪১৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যপুস্তিকায় লিখছেন—

"যতটাই সৎ আমি ততটাই ঘোর মিথ্যাবাদী
প্রেমের আকুতি জানে আমার আসল পরিচয়
একটার পর আরেকটা পাথর ফেলছি
কৃপণ জলের বালতিতে।
যেহেতু সবুজ পাতারাই আলোকের সাথে
সরাসরি কথা বলে, তাই
স্থির থাকলেও তারা আমাদের পথ প্রদর্শক।..."[১৩]

কবি জানেন প্রেমের গভীরতা। তিনি সৎ ও মিথ্যাবাদী বলে নিজেকে স্বীকার করে কৃপণ বালতিতে পাথর ফেলে যাচ্ছেন। কৃপণ বালতি একটা আধার। বলা যায় মনের আধার। সেই আধারের আয়তন যদি ক্ষুদ্র হয় তবে বৃহৎ প্রেমকে আশ্রয় দিতে সক্ষম হবে না। একবিংশ শতকের কবি সুকৃতি সিকদার বলছেন সবুজ পাতা যেমন আলোকের সঙ্গে কথা বলে, অর্থাৎ আলো ও পাতার যেরূপ সম্পর্ক, তেমনই হতে হবে মানব-মানবীর প্রেম।

কবি **রাখী সরদার** 'শস্য ভেজা চোখের দোহাই' (২০২১) কাব্যগ্রন্থে লিখছেন—

"বিরহী পাখিও জানে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
উড়ন্ত চুমুর শব্দে উনিশবতী বৃষ্টি নেমে আসে,
মাধবী টিলার ধারে মেঘ নৃত্যে অবুঝ চিকুর
এখন রাধিকা নামে মধুপুরে নেমেছে শ্রাবণ
ধরো যদি প্রিয় ঠোঁট ডুবে যায় ডাহুক বেলায়
দেহের ভণিতা ছেড়ে খুঁজে নিয়ো শুশুক খেলায়।"[১৪]

প্রেমে পূর্বরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্তর। রাখী সরদারের উক্ত কবিতায় অভিসার চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। অভিসার মিলনকে খুঁজতে থাকে। 'উনিশবতী বৃষ্টি' বলতে কবি উনিশ বৎসরের যুবতী নারীকেই বুঝিয়েছেন। শ্রাবণ প্রসঙ্গে বোঝা যায় এখানে বর্ষাভিসারের কথা বলতে চাচ্ছেন। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে কবি দুটি প্রাণীর কথা বলেছেন— এক. ডাহুক, দুই. শুশুক। 'ডাহুক বেলা' বলতে সন্ধ্যাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মিলন প্রসঙ্গে 'শুশুকের খেলা'র কথা বলছেন। 'শুশুক' একটি স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। এই প্রাণীটি জলের মধ্যে নানান ভঙ্গিতে বিচরণ করে, যাকে কবি খেলার আখ্যা দিচ্ছেন। শুশুকের মতো প্রেমের খেলাতে মেতে উঠতে বলছেন। এই ধরনের প্রাণীর প্রসঙ্গ এনে প্রেমকে বর্ণনা করে একবিংশ শতকে আগের শতকের থেকে ক্রমশ আলাদা হচ্ছে বলে আমার মত।

কবি **রুমা তপাদারের** 'ধুলোমাটির সংলাপ' (২০২৪) কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই প্রেমের কবিতা। তিনি লিখছেন—

'চুল খুলিস না সর্বনাশী'
খরিশ সাপের বিষ ঢেলেছ হৃদয় জুড়ে
শরীরে শরীর দিয়ে তাই ছুঁয়ে দেখোনি আমাকে
পাছে বিষ লেগে যায় ঘোর মৃত্যু প্রত্যহ কান্নায়...

তার কত পরে দেখো বেঁচে আছি পেখম মেলেছি ধীরে ধীরে
এখন মেঘের কান্না: 'সোহাগ নাচত' ডেকে বলে কান্না-নাশিনী এক্ষুনি কাছে আয়"[১৫]

রুমা তপাদারের প্রেমের কবিতাতে 'আহ্বান' থাকে। যদিও আহ্বান না থাকলে প্রেমের ঘনত্ব থাকে না। 'খরিশ সাপের বিষ' আসলে তীব্র প্রেমের কথাই বলা হচ্ছে। অন্যপিঠের মানুষটি তাকে ছেড়ে গেলে কথক আবারও ধীরে ধীরে পেখম মেলেছে। চলে যাওয়া সেই মানুষটিকে দেখলে এখনও তার কাছে যেতে কথক প্রস্তুত। সে জানে আবার তাকে ছেড়ে চলে যাবে আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষটি। যে কারণে শেষ পঙ্‌ক্তিতে তাকে ডাকছে 'কান্না-নিশিনী'-তে। এক তাকে পেয়ে এই রাত কান্নায় ভরে গেছে, আবার তার চলে যাওয়াতেও এই রাত 'কান্না-নিশিনী' হয়ে যাবে। আহ্বান ও তাকে পেয়ে আবার বিচ্ছেদ আবহমান। ফলে এই প্রেমের চিরন্তর সত্যকেও একবিংশ শতকের কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ছয়

স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা

আগের শতকেই স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা আমাদের নজরে এলেও একবিংশ শতকের কবিতা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা লিখেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এ সমস্ত কবিতায় কবি নিজে উত্তম পুরুষে তাঁর স্বীকারোক্তি পেশ করছেন। এই স্বীকারোক্তি ধরা পড়ছে কখনও তাঁর দুর্বলতা— কখনও-বা অন্য কোনও গোপনীয় বিষয়। এখানে কবি পুরোপুরি সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান, ফলে কবির মনটা থাকে অনেক সরল।

কবি **অর্ঘ্য মণ্ডল** অকপটে স্বীকার করছেন তাঁর জীবন-যন্ত্রণার কথা। 'অগোছাল' (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতায় লিখছেন—

"কাউকে দেখেছ আমার মতন হেসে
শরীরে মাখছে চাবুকাঘাতের গতি
অনেক দিনের অভিমান মুছে ফেলে
জীবনের ভাঁজে লুকিয়ে রাখছে নদী..."[১৬]

কবি স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন, এই জীবন চাবুকাঘাতের মতো নির্মম বাস্তব। যে বাস্তবের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি প্রতিনিয়ত হেরে যাওয়া মানুষ। তবু তিনি অভিমান লাঞ্ছনা ঝেড়ে ফেলে নদীকে জীবনের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছেন। নদী অর্থাৎ জীবনমুখীনতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। 'হলুদ, তোমাকে' (২০০৩) কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতাতেও দেখি এমনই দর্শন।

"অন্ধ বালক পথ ফুরোতে যেটুকু বেশি সময় নিচ্ছে
সেটাই আমার বসন্ত, যার মধ্যে ঢুকে
অরণ্যানল চুকুম দিয়ে
ঠান্ডা করে দিচ্ছ হিংসা, আর মণিদ্বীপ পরমততোষে
তোমার আমার মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে
ভ্রান্তিবিহীন শূন্য দিকে— চাওনি। তবু
এটাই তোমার জন্য
মহাকাল দিয়েছেন"[১৭]

যারা চোখে দেখতে সক্ষম তারা রাস্তা পেরোতে পারে দ্রুত, কিন্তু দৃষ্টিহীন মানুষের রাস্তা পেরোতে একটু সময় লাগে বেশি। কেউ কেউ হয়তো হাত ধরে পার করে দেয়। কবি বলছেন ওইটুকুই আমার বসন্ত। অর্থাৎ তাঁর

জীবনের আনন্দঘন মুহূর্ত খুব ক্ষীণ সময়ের জন্য আসে। সময়, সমাজ ও রাজনীতি কবিকে জীবনের অফুরন্ত বসন্তের সন্ধান না দিয়ে দাঁড় করিয়েছে কঠিন বাস্তবতার সামনে। যেখানে নেই কোনও মনোরম বাতাস।

কবি **রাখী সরদার** লিখছেন—

"আমার তো ডাকনাম ছিল না কিছুই কোনওদিন
অথচ প্রকাশ্যে তুমি, ডাক দিলে শোনো কুচিপুড়ি
মুহূর্তে ভিতর স্রোতে উন্মাতাল সহাগিনী নদী,
অবোধ লাবণ্য পাখি দুরু দুরু পালক ভেজায়

অভিমানে ছোঁয়াছুঁয়ি, কেঁপে ওঠে আড়ষ্ট আঙুল
তুমি বুঝি জাদু জানো! জমাট পাথরে ফোটে ফুল।"[১৮]

ডাকনাম বাঙালি সমাজে আদরের চিহ্নস্বরূপ। 'কুচিপুড়ি' ডাকনামে তাই কবির হৃদয় দুলে ওঠে। ভালবাসা সোহাগে মনের ভেতরের নদী উন্মাতাল হয়ে ওঠে। কবি বলেন, 'তুমি বুঝি জাদু জানো!'। এ যেন প্রেমের পূর্বরাগের কবির স্বীকারোক্তি।

কবি **অমিত সাহা** 'শূন্যতার আরও কাছে আসি' (২০১৮) লিখছেন—

"কর্মব্যস্ত একটা দিন যেমন টাটকা শোক ভুলিয়ে রাখতে পারে
ঠিক তেমনই অসীমের আভিজাত্যে মুগ্ধ হতে হতে
নিজেকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। অহম্ মিলিয়ে যায়... "[১৯]

কবির কর্মব্যস্ত জীবন যেমন শোককে ভুলিয়ে রাখে, তেমনই অসীমের আভিজাত্য অর্থাৎ বিস্তৃতি দেখে নিজেকেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সকলেই ভাবে এই সমাজের জন্য আমি খুবই প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু অনন্তের দিকে তাকালে, এ বিশ্বের দিকে তাকালে—বোঝা যাবে আসলে আমরা না থাকলেও পৃথিবীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না। তাই কবি বলছেন, 'অহম্ মিলিয়ে যায়...'। কবি এখানে জাগতিক সত্যের উপলব্ধির কথা তুলে ধরতে চাইছেন।

কবি **তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের** লেখাতে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা অনেক বেশি করে আমরা পাচ্ছি। 'যে জন রহস্য জানে' (২০২১) কাব্যগ্রন্থে তিনি লিখছেন—

"বাবা, বাবা, চুপ করো! আমি খুব একা হয়ে গেছি...
ধনুক আমার হাতে আজ আর মানাচ্ছে না, জানো?"[২০]

কবি নিসঙ্গ হয়ে আশ্রয় খুঁজেছে বাবার কাছে। কবির পিতা কবিকে শুধু নির্দেশ দিয়ে গেছেন একের পর এক, আর কবি তা পালন করতে করতে ক্লান্ত। তাই বলছে 'আমি খুব একা হয়ে গেছি...'। যে সন্তানকে যোদ্ধা হয়ে ওঠার কথা ছিল, যার জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার কথা ছিল— তার হাতে আজ ধনুক মানাচ্ছে না। কারণ, কবির বয়স হচ্ছে আর ভেতরে ভেতরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

এইভাবে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রতিটি কবিই তার কাব্যে কোনও না কোনওভাবে নিজের কথা বলেছেন। একবিংশ শতকের কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি আমরা। সেখানে নিজের অন্তরের কথা বলতে চাইছেন বাস্তবকে নিরীক্ষণ করে মননের সঙ্গে। আর আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে একবিংশ শতকের কবিতার অন্তরের স্বরূপটা।

বাংলা কবিতার কালান্তরের ইতিহাসে ষাটের দশক পঞ্চাশের দশকের মতো পুষ্টিকর ছিল না। এই দশকের তরুণ কবিদের যাত্রা শুরু হয়েছিল কয়েকটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এবং এই আন্দোলন সাহিত্যে খুব একটা ফলপ্রসু হয়েছিল বলে মনে হয় না। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল ছিল সারা দেশ। এই

আন্দোলনের প্রভাব পড়ল সমকালীন তরুণ কবি সমাজে— ফলে তাঁরাও বাংলা কাব্যে কয়েকটি আন্দোলন আনার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে 'হাংরি কাব্য আন্দোলন' ও 'শ্রুতি আন্দোলন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতার গতি এইভাবেই সত্তরের প্রস্তুতিপর্ব কাটিয়ে উন্মেষ আশি'তে এসে পৌঁছল। কবিতা নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা শুরু হল এই পর্বেতে এসে। একথা অত্যুক্তি নয় যে, কবিতার জন্য একবিংশ শতকের কবিরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। হয়তো তাঁদের এই Experiment সর্বদা সার্থক হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিক কবিদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটি বেশ সমৃদ্ধ বলেই আমার মনে হয়। পরিপুষ্ট তাঁদের চেতনার রাজ্যটিও।

চেতনার এই রাজ্যে সাম্প্রতিক কবিতাগুলি এক অভিনব আত্ম-উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত আনন্দরস প্রবাহিত করে। যে রসের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ধরা পড়ে এই সময়ের কবিতার 'নতুন রূপ, নতুন চেতনা'। এই রূপ কামনার, বাসনার; এই চেতনা অবগাহনের, উত্তরণের। এই যাত্রা চলছে নিজস্ব চালে, আপন গতিতে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা চায় যুক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে, সে অবলীলায় চলে যেতে চায় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। বহুমাত্রিকতা তার জঠরে বহন করে সে হতে চায় এ যুগের 'নীলকণ্ঠ'। বিশ্বায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নতুন নতুন শব্দজোট সৃষ্টি করে সাম্প্রতিক কবিতা। আবার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। এখানেই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিশালতা। উদার হৃদয়ে সে ঠাঁই দিয়ে চলেছে নবাগত রূপ-চেতনা।

একবিংশ শতকের কবি যখন কবিতা লেখেন, তখন তাঁর মর্মের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম বিন্দুটি কবিতার মধ্যে রেখে দিতে চান। রেখে যেতে চান, এক আশ্চর্য সঞ্জীবনী শক্তি। যে শক্তির সুধা পান করবে বর্তমান ও ভবিষ্যত বিপুল পাঠককুল। কবি একরকম নিজেকে নিঃশেষ করে পাঠকের জন্য রেখে যান তাঁর সারা জীবনের একটি একটি করে গেঁথে তোলা মালার সমগ্রতা। এই সমগ্রতা নিয়েই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছে।

তার এই যাত্রা অভিনব, স্বতন্ত্র তার ভঙ্গি; চিত্তাকর্ষক তার প্রকাশভঙ্গিমা। বহু অভিজ্ঞত প্রজ্ঞা থেকে সাম্প্রতিক কবিরা তাঁদের কাব্যের পরিকাঠামোটি সৃষ্টি করেন একজন সার্থক স্রষ্টার মতো। তাতে যে সকলেই সফলতা পায়, এমন মত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তবে অনেকাংশেই যে তা চিত্তকে হরণ করছে, সে বিষয়ে সুচিবায়ুগ্রস্থ হওয়ার কারণ দেখি না।

'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নয়, তা ভাবের বিষয়' কথাটি মেনে নিলে সাম্প্রতিক কবিতার অভিনব রীতিগুলিকে কোনওভাবেই নস্যাৎ করে দেবার উপায় থাকে না। কেননা, এটা সকলেই জানে যে, জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করে দিতে হয়। তার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাকে কেবল বুঝিয়ে বললেই হয় না, তাকে সৃষ্টি করে তুলতে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাগুলির নিবিড় পাঠে আমরা এর সত্যতা অনায়াসে পেয়ে যাই। একে শুধুমাত্র গ্রহণ করার শক্তি ও মানসিকতা থাকতে হবে।

একবিংশ শতকের বাংলা কবিতার মধ্যে অরিজিন্যালিটি খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। একটু গভীর মননের সাথে যদি আমরা সাম্প্রতিক কবিতাগুলি পাঠ করি, তাহলে বহু সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে অভিনবত্ব আমরা দেখতে পাব। আলোচিত অভিসন্দর্ভে আমরা দেখেওছি তাই। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাকে অবহেলায় আমরা দূরে সরিয়ে রেখে, নিজেরাই মূল্যবান কোনও কিছু থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছি, এই বোধ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ

করালে আমাদের তথা সাহিত্যের মঙ্গল হবে। একটা সত্য যেন আমরা না ভুলি যে, কবিতা আমাদের কাঁদায় না; কবিতার জন্ম আনন্দ দিতে, রস দিতে।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের পথে। 'সাহিত্যে নবত্ব'। বিশ্বভারতী, পৃ. ৮৬।
২। দাশগুপ্ত, ধীমান। সিনেমায় ইমেজ। কলকাতা: বাণীশিল্প, ২০০৪, পৃ. ২৬।
৩। মণ্ডল, অর্ঘ্য। অগোছাল। 'বাড়ি ফেরার কবিতা'। বনগাঁ: ফসিল। ১৪১৫ ব., পৃ. ৩২।
৪। মজুমদার, সব্যসাচী। মেঘ আর ভাতের কবিতা। 'আমন', ২০১২, পৃ. ১৪।
৫। মণ্ডল, বিবেকানন্দ। গোধূলি দহন। 'খেলা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৩, পৃ. ২০।
৬। বাউরী, জয়দেব। ট্যাগ। 'প্রাইভেসি'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৩, পৃ. ১৪।
৭। লেট, বঙ্কিম। মমি। 'প্রবেশক কবিতা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৪, পৃ. ৯।
৮। চক্রবর্তী, সুতপা। ভ্রমরযান। 'ভ্রমরযান ৩৯'। গুয়াহাটি: বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ, ২০২৪, পৃ. ৪৫।
৯। সাহা, অমিত। একট মিলন দাবি। 'সরল কবিতা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২০, পৃ. ১৫।
১০। তপাদার, রুমা। বালিকাপুরাণ। 'শকুন্তলা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৩, পৃ. ৪৫।
১১। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। আ লো ডোম্বী। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৯।
১২। মণ্ডল, বিবেকানন্দ। পদাবলীক্ষতপরিক্রমা। 'পূর্বরাগ'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২২, পৃ. ১০।
১৩। সিকদার, সুকৃতি। ভবঘুরে এক তৃণভোজী। 'যাদুকর'। হুগলি: মন্থন প্রকাশনা, ১৪১৭ ব., পৃ. ৭।
১৪। সরদার, রাখী। শস্য ভেজা চোখের দোহাই। 'শস্য ভেজা চোখের দোহাই ৫'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ১৩।
১৫। রুমা তপাদার। ধুলোমাটির সংলাপ। 'ধুলোমাটির সংলাপ বারো'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৪, পৃ. ২২।
১৬। মণ্ডল, অর্ঘ্য। অগোছাল। 'প্রবেশক কবিতা'। বনগাঁ: ফসিল, ১৪১৫ ব., পৃ. ৯।
১৭। অর্ঘ্য মণ্ডল। হলুদ, তোমাকে। 'প্রবেশক কবিতা'। বনগাঁ: ফসিল, ২০০৩, পৃ. ৯।
১৮। সরদার, রাখী। শস্য ভেজা চোখের দোহাই। 'শস্য ভেজা চোখের দোহাই ২০'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ২৮।
১৯। সাহা, অমিত। শূন্যতার আরও আছে আসি। 'অহম্ আবাম্ বয়ম্'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ২৬।
২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল। যে জন রহস্য জানে। 'যে জন রহস্য জানে'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ১১।